ভূমিকা

কিন্নর রায় সত্তর দশকের একেবারে শেষ পর্যায়ের লেখক। তাঁর স্ফুরণ ও বিস্তার ঘটে আশির দশকে। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বহুবার এসেছেন নানা আলোচনা সভায়। ২০১৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বক্তৃতা রাখার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তাঁর সেই বক্তৃতা আমি খুব মন দিয়ে শুনি কারণ তাঁর বলার ধরণ, ভাষা এবং কণ্ঠস্বর আমাকে খুবই আকৃষ্ট করে। আমার মনে হয় তাঁর ভাষার যে নির্মাণ বা ভাষার যে স্থাপত্য— এই পুরো ব্যাপারটা অন্যদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। সেই কারণেই বক্তৃতা শোনার পর আমি কিন্নর রায়ের লেখা বিভিন্ন ধরনের বই সংগ্রহ করতে আরম্ভ করি এবং পড়তে থাকি। সেই বইয়ের তালিকায় তাঁর উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য সবই ছিল। তাঁর নির্মিত সাহিত্য পড়তে পড়তে আমার মনের মধ্যে অনেক জিজ্ঞাসা জন্মাতে থাকে। ২০১৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি পুনরায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন। প্রায় একঘণ্টা ধরে তাঁর বলা কথাগুলো অন্য ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি আমাকেও একটা ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায়। আর তখন থেকেই আমি কিন্নর রায়ের উপন্যাস ও ছোটোগল্পকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করি এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই তাঁর সৃষ্ট আখ্যানের ওপর গবেষণাপত্র নির্মাণের। ফলত তাঁর প্রায় সমস্ত লেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে থাকি। সৌভাগ্যবশত ২০২০ সালে তাঁর সঙ্গে প্রথম কথা বলার সুযোগ হয় কারণ ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় তিনি পুনরায় বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির হন এবং প্রায় তিনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি নিবাসে থাকেন। সেই আলোচনাসভায় আমি সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করি, সেখানেই কিন্নর রায়ের সঙ্গে আমার প্রথমবার পরিচয় হয়। এতদিন ধরে আমার মনে যে বিবিধ প্রশ্ন জন্মেছিল, সেই বিপুল প্রশ্নমালা বা মনের গভীরে

উত্থাপিত জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি অতিথি নিবাসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। আমি আবার তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো নতুন করে পড়ি, নতুন করে ভাবি এবং নতুন করে পাঠের পর আবার তাকে নতুন করে পড়ি।

কিন্নর রায় এমন একজন লেখক যিনি খাদ্য আন্দোলন ও সশস্ত্র নকশাল আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। নকশাল আন্দোলনে যুক্ত থাকার ফলে তাঁকে বহুবার জেলে যেতে হয়। ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পর তিনি জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন যে তাঁদের দল ছিন্নভিন্ন এবং কেউ কারোর সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ রাখছেন না ফলে তাঁকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। তিনি মন দেন নিজের লেখালিখি ও পড়াশোনায়। ১৯৮১ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কাছেই নরক' প্রকাশিত হয় যা মূলত জেল জীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যদিও এর পূর্বে বেশকিছু ছোটোগল্প তিনি লেখেন। আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেই সমাজের যা যা অসংগতি, যা যা অসুবিধে তাঁর চোখে পড়ে— সমস্তটাই তাঁর লেখার মধ্যে উঠে আসে। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি কখনো আপোষ করেননি বা কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকও বেছে নেননি। কাহিনি সর্বস্ব চটকদারি গল্প, প্রেম ও যৌনতা প্রভৃতিকে বিসর্জন দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কলমে স্থান দেন রাজনৈতিক অসন্তোষ, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সহ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের জীবনের সমস্যা ও সংকট। পাশাপাশি তুলে আনেন প্রকৃতি-পরিবেশের বিপন্নতার চিত্র। তিনি স্বপ্ন দেখেন সুখী, সুন্দর ভারতবর্ষের— যেখানে সব লোক খেতে পাবে, সবাই সুশিক্ষা পাবে, সকলের জন্য সমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকবে এবং সকলের জন্য ধনের সমবণ্টন হবে। তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সুস্থ, সুন্দর সমাজের স্বপ্ন বুনে দিতে চান। সেই অনবরত স্বপ্ন বুননের কাজটি তিনি এখনো করে চলেছেন। গবেষক হিসেবে আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি এমন স্রষ্টাকেই নির্বাচন করেছে। বিবিধ বিষয় বা বিচিত্র বিষয় নিয়ে

কিন্নর রায় যা যা লিখেছেন এবং এখনো লিখে চলেছেন— সেই বিষয়ের বহুমাত্রিকতা বাংলা সাহিত্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক তা আমার আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

আসলে যেকোনো লেখার গভীর থেকে গভীরতর দিকে যেতে গেলে একজন লেখকের পূর্ণাবয়ব ক্রমশ প্রস্ফুটিত হয় আমাদের সামনে। কথাসাহিত্যিক কী লেখেন, কেন লেখেন, কোথা থেকে লেখেন এই মুহূর্তমালারা ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। যেমন— কোনো বাগানে ঢুকতে গেলে প্রথমে আমরা শুধুই গন্ধ পাই, ফুল ফুটেছে কিনা তা দেখতে পাই না। গন্ধ অনুসরণ করে এগোতে হয়। এগোতে এগোতে সবুজ পাতা, গাছ, দূর্বাঘাস, ফড়িং, দোয়েল, শ্যামা, কোকিলের নাচানাচি, কাকের উড়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখতে দেখতে আমরা ফুলের কাছে পৌঁছোই। তখন ফুলের সুঘ্রাণ ক্রমশ আমাদের জারিত করে। একইভাবে যেকোনো লেখকের জীবন, লেখকের পাঠভ্যাস, লেখকের প্রাত্যহিকতা— এই সবটাই মিশে থাকে তাঁর লেখার মধ্যে, তাঁর নির্মাণের মধ্যে। তাঁর গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা সবের মধ্যেই মিশে থাকে তাঁর জীবনযাপনের ভাঙা অথবা পূর্ণচাঁদ। আলোর গভীরে যে আলো থাকে, স্রোতের আড়ালে যে স্রোত, পুকুরের টলটলে জলের ভেতরে যে আরো জলবাহার— এই সবটা লেখকের লেখা অনুসরণ করতে করতে আমরা ক্রমশ পেতে থাকি।